৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
পৌষ-মাঘ ১৪১৫
জানুয়ারি ২০০৯
পল্লীতথ্য বুলেটিন একটি ডি.নেট প্রকাশনা।

পল্লীতথ্য

কৃষি ▪ শিক্ষা ▪ স্বাস্থ্য ▪ অ-কৃষি উদ্যোগ ▪ লাগসই প্রযুক্তি ▪ আইন ও মানবাধিকার ▪ সচেতনতা

ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ

- গোলমরিচের চাষ পদ্ধতি
- শিশু আইন
- কৌটায় মসলা জাতীয় ফসল সংরক্ষণ
- শিশুর খাদ্য চাহিদা

সম্পাদকীয়

শিক্ষার আলোয় দুর হোক সব অন্ধকার

শিক্ষা ও শিক্ষক একটি জাতির উন্নতির চাবিকাঠি। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মনে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভুমিকা অগ্রগণ্য। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী, উৎপাদন সহায়ক ও সৃজনধর্মী করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা; এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা প্রদান করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ লক্ষ ও উদ্দেশ্য সাধনে আর শিক্ষাদানের মতো জাতিকে গড়ে তোলার গুরুদায়িত্বে নিয়োজিত দেশের শিক্ষকসমাজের প্রতি সম্মান জানানোর জন্যই মূলত সরকার একটি বিশেষ দিন ঘোষণা করেছে। সে অনুযায়ী প্রতি বছর ১৯শে জানুয়ারি জাতীয় শিক্ষক দিবস পালিত হয়।

'প্রিয়জনকে বই উপহার দিন' - জাতীয়ভাবে আমাদের বইয়ের প্রতি মূল্যবোধ পরিবর্তনের সাথে এ কথাটি একাত্ম। সামনে অমর একুশে বইমেলা, ঠিক তার আগে জাতীয় মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে পহেলা জানুয়ারি জাতীয় গ্রন্থ দিবস পালন অনন্য ভুমিকা পালন করবে বলে আমার ধারণা। বই শুধু জ্ঞানই বৃদ্ধি করে না, সমৃদ্ধ জাতি তৈরিতে সহায়ক স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে।

আমরা জানি মানুষের খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য অসংখ্য খাদ্যশস্য রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ধান, গম, ডালসহ হরেক রকম খাদ্যবীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষনের প্রয়োজন হয়। গ্রামের মহিলারা পুরুষের পাশাপাশি এসব কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। সঠিক বীজ সংরক্ষণের অভাবে পরিমাণগত ও গুণগত দিক থেকে এসব খাদ্যশস্যের অনেক অপচয় ও ঘাটতি হয়। বাংলাদেশে-এর গড় শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ। তাই বর্তমানে ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের অপচয় রোধ করা এবং এর যথাযথ ব্যবহার নিয়ে বিশদ আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

এসংখ্যায় অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করে গোলমরিচ চাষ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনৈতিক ভিত সুদৃঢ় ও কম সময়ে অধিক উপার্জন পেতে গোলমরিচ এক অর্থকারী ফসল হিসেবে বিবেচিত। তাই গোলমরিচ চাষ করতে কৃষকের ক্ষেত প্রস্তুত, চারা উৎপাদন ও রোপণ প্রণালী, রোগ প্রতিরোধ, দ্রুত চারা উৎপাদন পদ্ধতি এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গোলমরিচ চাষ নিয়ে আজকের এ সংখ্যায় রয়েছে বিশেষ প্রতিবেদন।

সূচি

- বিভিন্ন ধরণের ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ
- হ্রাস পাচ্ছে বাঁশ চাষ
- গোলমরিচের চাষ পদ্ধতি
- শিশু আইন
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ (পর্ব-২)
- কৌটায় মসলা জাতীয় ফসল সংরক্ষণ
- শিশুর খাদ্য চাহিদা
- কীভাবে জ্বর মাপতে হয় তার সচিত্র পদ্ধতি
- কম্পিউটার টিপস্
- জানুয়ারি মাসের বিশেষ বিশেষ দিন

সম্পাদক
মাহমুদ হাসান

নির্বাহী সম্পাদক
খায়রুল হাসান

সহকারী সম্পাদক
ইখতিয়ার হাসান
সেলিনা সুলতানা

অনলাইন ব্যবস্থাপক
এস.এইচ.এম. আরাফাত

বিপণন ও বিতরণ
আফরোজা মেরিন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
খায়রুল হাসান সুমন

মুদ্রণ
পাথওয়ে

ছবি: ইখতিয়ার হাসান, ডি.নেট ও ইন্টারনেট থেকে সংগৃহিত।

বিভিন্ন ধরনের ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য অনেক কষ্ট করে ক্ষেতে খাদ্যশস্য উৎপাদন করে। এসব খাদ্যশস্যগুলোর মধ্যে রয়েছে ধান, গম, ডাল প্রভৃতি। এসব খাদ্যশস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়। গ্রামের মহিলারা পুরুষের পাশাপাশি এসব কার্যাবলী পরিচালনা করে। পুরাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে গিয়ে পরিমাণগত ও গুণগত দিক থেকে এসব খাদ্যশস্যের অনেক অপচয় হয়। বাংলাদেশের গড় শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ। তাই বর্তমানে ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের অপচয় রোধ করার চেষ্টা করা হয়। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কম সময় ও কম শ্রমে অধিক ফসল উৎপাদন ও সংরক্ষণ করা সম্ভব।

ধান মাড়াই

অল্প জমির ধান হলে উঠানে শক্ত স্থানে বা পাকা মেঝে কিছু আঁটি একত্র করে পিটিয়ে ধান গাছ থেকে ধান আলাদা করা যায়। বেশি জমির ধান হলে ধানের আঁটিগুলো পরিষ্কার জায়গায় বৃত্তাকারে রেখে গরুর পায়ের নিচ দিয়ে ধান আলাদা করা হয়। একে ধানের মলন বলে। এরপর বাতাসের অনুকূলে উড়িয়ে ভাঙ্গা খড়কুটা ও ধানের চিটা

আলাদা করে ধান পরিষ্কার করা হয়। এই পদ্ধতিকে ধান ঝাড়াই বলে। এভাবে পুরাতন পদ্ধতিতে মাড়াই কাজ করা হয়। আধুনিক পদ্ধতিতে মাড়াই যন্ত্র পদচলিত, কিন্তু এই পদ্ধতিতে শক্তিচালিত মাড়াই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এতে অল্প সময় ও শ্রমে অধিক উৎপাদন সম্ভব আবার অপচয়ও কম হয়। যন্ত্রটি চালানোর জন্য ১ জন লোকই যথেষ্ট। সিলিন্ডারে কাঁটাযুক্ত দাঁত সাজানো থাকে। যন্ত্রের প্যাডেলের চাপে সিলিন্ডারটি দ্রুত ঘুরতে থাকে। তখন সিলিন্ডারের কাঁটাযুক্ত দাঁতের উপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ধান ধরা হয়। এভাবে করতে থাকলে ধানগুলো পৃথক হয়ে মাটিতে ঝড়ে পড়ে। ঘূর্ণায়মান সিলিন্ডারের সাহায্যে মাড়াই হয়ে পাকায় খড় ও ধান পৃথক হয়ে বের হয়। এভাবে একসাথে মাড়াই ও ঝাড়াই কাজ হয়।

শুকানো

ধান শুকানোর জন্য পরিষ্কার উঠানে বা পাকা জায়গায় বিছিয়ে দিয়ে রোদে শুকানো হয়। এতে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী ফসলের অপচয় করে। সেজন্য শুকানোর ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

চাল

ধান ভাঙানোর পরে চাল হয়। ধান সিদ্ধ করে ভাঙালে আমরা যে চাল পাই তাকে সিদ্ধ চাল বলে। এই চাল আমরা ভাত রান্নার ক্ষেত্রে ব্যবহার করি। ধান সিদ্ধ না করে ভাঙালে যে চাল হয় তাকে আতপ চাল বলে। এ চাল আমরা পিঠা তৈরির জন্য ব্যবহার করি। চাল ভালভাবে সংরক্ষণ করা না হলে ছত্রাক আক্রমণ করে এবং চাল সাদা বিবর্ণ হয়ে যায়। সংরক্ষণ সঠিক না হলে চাল নষ্ট হয়ে যায় এতে চালের গুণাগুণ ও স্বাদ ভাল থাকে না। বর্ষাকালে চালের মধ্যে ছত্রাক ও পোকার আক্রমণ বেশি হয়। মেশিনে ধান ভাঙানোর পর তুষ ও কুড়াসহ চাল রেখে দিলে বেশি দিন ভাল থাকে। ড্রামে ও টিনে চাল শুকিয়ে শুকনো মরিচ, কিছু রসুন ও কিছু শুকনো নিমপাতা চালে রেখে দিলে পোকার উপদ্রব থেকে রেহাই পাওয়া যায়। সংরক্ষিত চাল মাঝে মাঝে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে রোদে দিয়ে আবার টিনে বা ড্রামে সংরক্ষণ করতে হবে।

গম মাড়াই ও ঝাড়াই

গম পাকার সাথে সাথে গম গাছ শুকিয়ে যায়। কাটার পর গাছগুলো আঁটি বেঁধে বাড়ির উঠানে মাড়াইয়ের জন্য রাখা হয়। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে গম মাড়ানো ভাল। একটা কাঠের তক্তার উপর পিটিয়ে গমের দানা আলাদা করা হয় বা পাকা স্থানে রেখে বাঁশের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে দানা ছাড়ানো হয়। তাছাড়া গরুর পায়ের নিচে ফেলে ধানেরমত গম মাড়াই করা যায়। তারপর অনুকূল বাতাসে কুলা বা চালনি দিয়ে মাড়াই করা গম থেকে খড়কুটা আলাদা করা হয়। অল্প সময় ও শ্রমে অধিক ফসল পাওয়ার জন্য আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। একই যন্ত্র দিয়ে ধান ও গম মাড়াই করা যায়। তবে ব্যবহার প্রক্রিয়া পৃথক। ধান মাড়াই করার সময় সিলিন্ডারটির উপরে কাঁটা সংযুক্ত থাকবে। কিন্তু গম মাড়ইয়ের সময় তা থাকে না। সিলিন্ডারটি ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে। সিলিন্ডারের নিচে বাকানো চালনি থাকে। গমের আঁটি যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করালে সিলিন্ডার ঘুরতে থাকবে এবং ঘর্ষণের ফলে গম আলাদা হয়ে যায়। তারপর চালনি দিয়ে খড়কুটা পরিষ্কার করে।

শুকানো

সাধারণত উঠানে বা পাকা মেঝেতে গম শুকানো যায়। কয়েকবার রোদে শুকানোর পর গম গোলাজাত করা হয়। অবহাওয়া ভাল না হলে উন্নতমানের গম শুকানোর যন্ত্র দিয়ে গম শুকানো হয়। জলীয় অংশ

শতকরা ১২-১৩ ভাগে নামলে বুঝতে হবে যে গম ভালভাবে শুকিয়েছে। তাছাড়া গ্রামের মহিলারা দাঁতের নিচে দিয়ে চাবালে কট কট শব্দ হলে বুঝতে পারেন যে গম শুকানো হয়েছে।

গম সংরক্ষণ
চালেরমত গম ঘরে তোলার পর ভালভাবে শুকানোর পর টিনে বা ড্রামে রাখা যায়। তাছাড়াও মাঝে মাঝে রোদে শুকানো ভাল। গম দিয়ে সুস্বাদু খিচুড়ি ও হালিম প্রস্তুত করা যায়। গম ভাঙানোর পর আটা, ময়দা ও সুজি তৈরি করা হয়।

ডাল
বাংলাদেশে সারা বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের ডাল মসুর, মুগ, মাষকলাই ডাল উৎপন্ন করা হয়। সব ডালের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ প্রায় একই। মাড়াই ও শুকনোর জন্য ব্যবহৃত খেলা মসৃণ ও শক্ত রাখার জন্য গোবরের প্রলেপ ব্যবহার করা হয়। ফসলে জীবাণু আক্রমণ করলে খাওয়ার অনুপযোগী ও বিক্রি করার ক্ষেত্রে এর দাম কমে যায়। গাছসহ শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ডাল মাড়াই করা যায়। আর পরিমাণ বেশি হলে গরু দিয়ে মাড়াই করা হয়। তারপর কুলা অথবা চালনি দিয়ে চেলে ছোট অংশ ও দানা আলাদা করা হয়। অপচয় রোধ করার জন্য উন্নত যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। শুকানো ও পরিষ্কার করা হলে ভাল ঢাকানাযুক্ত টিনে রাখতে হয়।

ডাল সংরক্ষণ
ডাল জাতীয় শস্য মৌসুমে ভালভাবে শুকিয়ে গৃহ পরিসরে ঢাকনাযুক্ত টিন বা ড্রামে সংরক্ষণ করা হয়। এ সমস্ত ডাল খোসাসহ রাখলে বেশি দিন ভাল থাকে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী ২/১ মাসের জন্য ভাঙালে চলে।

সরিষা, তিল ও তিসি মাড়াই ও ঝাড়াই
এসব ফসল গাছগুলো মাড়াই করার আগে ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। এরপর লাঠি দিয়ে নরম হাতে আঘাত করে শিম থেকে দানা আলাদা করা হয়। ফসলের পরিমাণ বেশি হলে গরু দিয়ে মাড়াই করা হয়। এরপর কুলা বা চালনি দিয়ে চেলে পরিষ্কার করতে হয়। ধান মাড়াইয়ের যন্ত্রের সাহায্যে এগুলো মাড়াই করা হয়। তবে সিলিন্ডারের উপরে কাঁটা থাকে না। সিলিন্ডারের নিচে ট্রে থাকবে। ঘর্ষণের ফলে সিম থেকে দানা আলাদা হয়ে যাবে। চালনির সাহায্যে ঝাড়াইয়ের কাজ করা হয়। ঢাকনা ব্যবহার করে অপচয় রোধ করা যায়।

শুকানো
শুকানোর ক্ষেত্রে উঠানে ও মেঝেতে ডালা, পাটি অথবা মাদুর প্রভৃতিতে শুকাতে হয় এতে অপচয় রোধ হবে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে ২/৩ দিন শুকালে এসব ভালভাবে শুকায়। আবহাওয়া প্রতিকূল হলে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে শুকানো হয়।

সূর্যমুখী মাড়াই ও ঝাড়াই
ফুলের শুকনো মাথায় হাত দিয়ে অন্য ফুলের মাথা দিয়ে ঘষলে বীজ ছাড়ানো যায়। আবার লাঠি দিয়ে আস্তে আস্তে ফুলের মাথায় উল্টা দিকে আঘাত করলে বীজ বের হয়ে আসে। তারপর চালনি দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করা যায়।

শুকানো
মাড়াই ও মাড়াইয়ের কাজ শেষ হলে পাকা মেঝে পাটি, মাদুর বা ডালাতে পাতলা করে ছড়িয়ে দিয়ে শুকাতে হয় শুকানো হলে গোলাজাত করে সংরক্ষণ করা হয়।

চিনাবাদাম উঠানো ও মাড়াই
শতকরা ৪৮-৫০ ভাগ তেল এবং ২৪-২৫ ভাগ আমিষ চিনাবাদামে থাকে। চিনাবাদাম অন্যান্য তেল বীজেরমত নয়। তেলবীজ হিসাবে চিনাবাদাম ব্যবহার করা হলেও পৃথিবীর অনেকের সরাসরি চিনাবাদাম খাওয়া হয়। বাংলাদেশেও চিনাবাদাম সরাসরি খাওয়া হয়। মাটির নিচে গাছের মূলে এই তেলবীজ জন্মে। জমি থেকে চিনাবাদাম সংগ্রহ করার পর মাটি পরিষ্কার করে উঠানে শুকানোর জন্য দেওয়া হয়। মাটি থেকে তুলার পর এর দানায় ৫০-৬০% আর্দ্রতা থাকে। এবার ৪/৫ দিন ভালভাবে রোদে শুকানোর পর গোলাজাত করে সংরক্ষণ করা

হয়। তেলবীজ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য খোসাসহ মাড়াই ও ঝাড়াইয়ের কাজ করা হয়। শস্যের আর্দ্রতা ৫০-৬০% থেকে কমিয়ে ২০-২৫% এ আনতে হয়। হস্তচালিত ও পদচালিত উভয় প্রকার যন্ত্র বর্তমান বাজারে পাওয়া যায়। মাড়াইয়ের জন্য যন্ত্রের উপরে বাদাম দিয়ে যন্ত্রচালক হাতলের সাহায্যে চাকাটি ঘুরালে এর চালনির সাথে ঘর্ষণ হয় এর ফলে বাদাম মাড়াই ও ঝাড়াই করা যায়। হস্তচালিত যন্ত্রে ৭০ থেকে ৮০ কেজি বাদাম মাড়াই করার জন্য চাকাটি মিনিটে ৬৫ বার ঘুরে। শক্তিচালিত যন্ত্র হস্তচালিত যন্ত্রের মতই। তবে বৈদ্যুতিক মটরের সাহায্যে ২০৯ কেজি বাদাম মাড়াই ও ঝাড়াই করতে মিনিটে ৩০০ বার ঘুরে।

ভূট্টা

দানা জাতীয় ফসল ভূট্টা। একটি করে মোচা প্রতিটি গাছে থাকে। তবে দুইটি করে মোচাও থাকতে পারে। লম্বালম্বি সারি করে দানাগুলো ভূট্টার মোচায় সাজানো থাকে। যন্ত্র ছাড়া এসব মোচা থেকে দানাগুলো হাতে আলাদা করা যায় না। ফসল কাটার পর মোচা শুকানোর জন্য বাতাসে খোলা অবস্থায় রাখা হয়। বৃষ্টির সময় ফসল কাটা হলে খোসা ছাড়ানোর পর শুকানোর স্থানে আনা হয়। ভিজে থাকা মোচা সরাসরি রোদে না শুকিয়ে ২/১ দিন বাতাসে শুকাতে হয়। মোচা বিভিন্ন ভাবে শুকানো যায়। যেমন-

১. রোদে পাতলা করে শুকানোর জন্য উঠানের পরিষ্কার জায়গায় ধান, ডাল ও অন্যান্য শস্যেরমত ছড়িয়ে শুকানো হয় এবং মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করতে হয়।

২. শুকানোর জন্য ট্রে ব্যবহার করা হয়। মাটি থেকে উচুতে ট্রে বা ধাতু নির্মিত পাত্র তৈরি করা হয়। বাতাস নিচ থেকে উপরে ও ভিতর দিয়ে চলাচল করার জন্য মোচা ২-৩ স্তর বিছিয়ে দিতে হয়। বৃষ্টির সময় মোচা শুকানোর জন্য প্লাস্টিক শিট দিয়ে তাবুরমত আবৃত করে দেওয়া হয়।

৩. ঘরের বেড়া, মোচা ঝুলিয়ে তামাক পাতারমত শুকানো হয়। এক্ষেত্রে মোচা থেকে খোসা না ছাড়িয়ে উল্টিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়। ২-৪ টি মোচা এভাবে একত্রে বেঁধে বেড়ায় বা তার অথবা দড়িতে ঝুলিয়ে শুকানো যায়। ইঞ্জিনচালিত বড় বা হস্তচালিত ছোট যন্ত্রের সাহায্যে দানা ছাড়ানো যায়। হস্তচালিত যন্ত্রে চালক সিটে বসে বাম হাত দিয়ে চোঙের ভিতর দিয়ে ভুট্টার মোচা ঢুকান এবং ডান হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘণ্টা ৩০-৩৫ কেজি ভুট্টা মাড়াই করতে পারে।

একত্রে অনেক মোচা ছাড়ানোর জন্য শক্তিচালিত যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে এই মাড়াই যন্ত্রটি চালানো হয়। ডালা, কুলায় একজন লোক ভূট্টার মোচা হপারের ভিতর দিয়ে থাকে এবং সিলিন্ডার ঘুরে মাড়াই করা হয়। এক্ষেত্রে মোচাগুলো নির্গমন দিয়ে আলাদা জায়গায় এবং দানাগুলো সিলিন্ডারের গায়ের ছিদ্র দিয়ে নিচের ট্রেতে জমা হয়।

শুকানো

দানা ছাড়ানো হলে দানা শুকানো না হয় তাহলে অন্যান্য শস্যেরমত রোদে শুকাতে হয়। দানার আকার বড় হওয়ার কারণে শুকাতে সময় লাগে। তারপর ঢাকনাযুক্ত পাত্রে গোলাজাত করতে হয়।

হ্রাস পাচ্ছে বাঁশ চাষ

আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় একটি উদ্ভিদের তালিকায় বাঁশ অন্যতম। আগে গ্রামে মাঠের পর মাঠ বাঁশ বাগান দেখা যেত। আজ আর তেমন দেখা যায় না। অধিক জনসংখ্যা, ঘরবাড়ি নির্মাণসহ ইত্যাদি কারণে বাঁশ বাগান উজার হয়ে যাচ্ছে। এদেশে বাঁশের মত এত উপকারী আর কোন উদ্ভিদ নেই। বাঁশ আমরা নানাভাবে ব্যবহার করে থাকি। বাংলাদেশের প্রতি বছর নির্মাণ কাজে প্রায় একশ কোটি টাকার বাঁশ ব্যবহার হয়। বিভিন্ন আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সমন্বয়ে তৈরি হয়। ঝাঁপি, টুকরি কুলা ও ছাতার বাট বানানোর এবং বহু কুটির শিল্পে রয়েছে বাঁশের ব্যবহার। কাগজ তৈরি শিল্পে কাঁচামাল হিসেবেও বাঁশ প্রয়োজন। আমারা বছরে প্রায় দশ লক্ষ টন শুকনো বাঁশ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছি। এর মধ্যে গ্রাম থেকে আসে প্রায় আড়াই লক্ষ টন। আর বনাঞ্চল থেকে আসে প্রায় দুই লক্ষ টন।

বাঁশের চাহিদা যে পরিমাণ তার তুলনায় উৎপাদন কম। উৎপাদন কম হওয়ার কারণে বাঁশের মূল্য আগের চেয়ে অনেক বেশি। প্রতিদিনই বেড়ে চলছে ঘাটতি। এক সমীক্ষায় জানা যায়, ১৯৯৮ সালে বাঁশের সরবরাহ ছিল ৬৫৬ মিলিয়ন, পক্ষান্তরে চাহিদা ছিল ৭০৯ মিলিয়ন। বর্তমানে ঘাটতি আছে ৫৩ মিলিয়ন। পাশাপাশি প্রাকৃতিক বাঁশ বনের সংকোচনের হার দুই শতাংশেরও বেশি।

কুটির শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণের দুস্প্রাপ্যতা ও মূল্য বৃদ্ধির সাথে বাঁশ সংগ্রহের সংকট রোধে এগিয়ে আসতে হবে আমাদের। বাঁশের বংশ বৃদ্ধি– বাঁশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির বিকল্প নেই। বনাঞ্চলের প্রধান প্রজাতি বাঁশ মূলি, মিতিংগা ইত্যাদি বীজ থেকে গজায়। বর্তমানে চট্টগ্রামের বণাঞ্চলে মূলি বাঁশের বীজ যদি সঠিকভাবে সংগ্রহ করে লাগানো যায় তা হলে বাঁশের ঘাটতি অনেকটাই কমে আসবে।

বাঁশের চারা লাগানোর পর প্রথম তিন চার বছর ঝাড়ের গোড়া থেকে আগাছা পরিষ্কার করা দরকার। প্রতি বছর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ঝাড়ের গোড়ায় ইউরিয়া, পটাশ, ফসফেট সার বাঁশঝাড় বৃদ্ধির জন্য দরকারী উপাদান। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির চাহিদা নিবারণের জন্য প্রচুর কৃষি সরঞ্জামের যোগান দিতে হবে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাপক বাঁশ চাষের মাধ্যমে এ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। তা ছাড়া বাঁধের ধারে, খালের পাড়ে, পাহাড়ের ঢালে বাঁশ চাষ করে ভূমিক্ষয় রোধ করা ছাড়াও জমির

সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে। এতে কেবল জমির উর্বরতাই সংরক্ষণই নয়, খাল-বিল ও নদী পৃষ্টের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণে রেখে বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

একের পর এক সমস্যা আর নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমাদের অত্যাধুনিক বিলাসবহুল জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। বিলাসবহুল ভোগ-বিলাসিতা নয়, আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা সকলে মিলে বিশুদ্ধ পানি, সুবজ বৃক্ষের নির্মল বাতাস আর সূর্যের সোনালি আলো রেখে যেতে পারি সেটাই হোক আমাদের সচেতন প্রয়াস।

সূত্র:http://www.ittefaq.com/content/2009/03/15/news0925.htm

গোলমরিচের চাষ পদ্ধতি

গোলমরিচ একটি মসলা জাতীয় অর্থকরী ফসল। খাবারকে সুস্বাদু করতে এবং বিভিন্ন ভেষজ ওষুধের সাথে এর ব্যবহার দেখা যায় আমাদের দেশে।

সরকারের কৃষি বিভাগ গ্রামীণ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে উৎসাহ দিয়ে আসছে গোলমরিচ চাষে। যার ফলে গ্রামীণ কৃষি পরিকাঠামোর অবস্থান অনুযায়ী সচেতন শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত চাষিরা গোলমরিচ চাষে এগিয়ে আসছে। গ্রামীণ অর্থনৈতিক ভিত সুদৃঢ় ও কম সময়ে অধিক উপার্জন পেতে গোলমরিচ এক অর্থকারী ফসল হিসেবে বিবেচিত। তাই গোলমরিচ চাষ করতে কৃষকের ক্ষেত প্রস্তুত, চারা উৎপাদন ও রোপণ প্রণালী, রোগ প্রতিরোধ, দ্রুত চারা উৎপাদন পদ্ধতি এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গোলমরিচ চাষ নিয়ে আজকের এ প্রতিবেদন।

গোলমরিচ লতা জাতীয় উদ্ভিদ। পান গাছ, ওদাল, বেত ইত্যাদির মত গোলমরিচ এক পরাশ্রয়ী গাছ। এজন্য গোলমরিচের অন্য গাছের আশ্রয় প্রয়োজন। আম, সুপারী, কাঁঠাল, মান্দার, তেঁতুল, নারিকেল, তাল, সিলভার, অক, টিক, খেজুর ইত্যাদি গাছ গোলমরিচের আশ্রয়ী হিসেবে ব্যবহার হয়। এছাড়া অমসৃণ ছাল থাকা গাছে গোলমরিচ গাছ ওঠার জন্য সুবিধা হয়।

গোলমরিচের চারা উৎপাদন পদ্ধতি

সাধারণত গোলমরিচের চারা ডালের কলম থেকে তৈরি করা হয়। গোলমরিচের গাছের গোড়ার অংশকে 'রানার' বলা হয়। রানারের প্রতিটি গাঁট থেকে শিকড় বের হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। রানারের প্রতি তিনটি গাঁটের একটি অংশ কেটে নিয়ে আশ্রয়ী গাছের কাছে 'সরা' লাগিয়ে দিতে হয়। মাটির সঙ্গে ৩ : ১ অনুপাতে দাগ দিয়ে একটি পালং তৈরি করে তাতে গোলমরিচের ডাল থেকে তিনটি গাঁটযুক্ত কলম কেটে লাগাতে হবে। এক থেকে দেড় মাস পর ওই কাটিং থেকে শিকড় বেরিয়ে আসবে। তখন পলিথিন ব্যাগে ৪ ইঞ্চি করে ৩ ভাগ দো-আঁশ মাটি ভর্তি করে ওই শিকড়যুক্ত কাটিং থেকে সাবধানে উঠিয়ে পলিথিন ব্যাগে রোপণ করে দিতে হবে। রোপণের পূর্বে বাঁশের কাঠি দিয়ে পলিথিন ব্যাগের মাটিতে গর্ত করে নিয়ে শিকড়যুক্ত কাটিং লাগাতে হবে। ৪৫ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে একটি সুন্দর চারা গজাবে। সাধারণত চৈত্র-বৈশাখ মাস চারা উৎপাদনের পক্ষে উপযুক্ত সময়।

দ্রুত চারা উৎপাদন পদ্ধতি

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গোলমরিচের চারা উৎপাদনের জন্য দ্রুত চারা উৎপাদন পদ্ধতি কার্যকর। একটি গাছ থেকে বছরে অন্তত ৩০ থেকে ৩৫ টি চারা উৎপাদন করা সম্ভব। এজন্য একটি ছায়াঘর তৈরি করতে হবে। প্লাস্টিকের তৈরি বিশেষ ধরনের শেডনেট ব্যবহার করে ছাউনিও তৈরি করা যায়। ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ বৃষ্টির পানি আটকানোর ক্ষমতা বিশিষ্ট এ নেটের মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ রোদ প্রবেশ করতে পারে। ঘরের বাঁশের খুঁটির সারির উচ্চতা হতে হবে প্রতি ৩ মিটার এবং দুপাশের খুঁটির উচ্চতা হবে ২ মিটার। ঘরের মধ্যে ১মিটার দূরত্ব বজায় রেখে ৭৫ সেন্টি মিটার গভীর এবং ৩০ সেন্টি মিটার প্রস্থের নালা তৈরি করতে হবে। নালাগুলো বালিমাটি, কম্পোস্ট, কাঁঠালের গুঁড়ো এবং সারমিশ্রিত মাটি সমানভাগে মিশিয়ে ভর্তি করতে হবে। এখন ওই নালার এক ফুট অন্তর অন্তর ভাল জাতের সুস্থ চারা 'মাতৃগাছ' হিসেবে রোপণ করতে হবে। দুই নালার মধ্যবর্তী জায়গার দুই মাথায় খুটি পুঁতে মাটির সঙ্গে আনুভূমিকভাবে একটি লম্বা বাঁশ বেঁধে দিন। এবারে একটি বেথু বাঁশের ১.২৫ মিটার লম্বা টুকরোকে দুভাগে ভাগ করে প্রতিটি মাতৃগাছের গোড়ায় বসিয়ে মাঝের বাঁধা আনুভূমিক বাঁশ হেলান দিয়ে রাখুন যাতে আধখানা বাঁশের টুকরো মাটির মাটির সঙ্গে ৪৫ ডিগ্রি কোণ তৈরি করে। এবারে আধখানা বাঁশের টুকরোতে বালু কাঠের গুঁড়ো, কম্পোস্ট ১:১:১ অনুপাতে ভালভাবে মিশিয়ে ভর্তি করুণ। গোলমরিচের প্রতিটি গাঁট মাটির সংস্পর্শে বেঁধে দিন, এর ফলে প্রতি গাঁট থেকে শিকড় বেরিয়ে আসবে। ৩ থেকে ৪ মাসের মধ্যে গোলমরিচের লতা আধখানা বাঁশের মাথা পেরিয়ে যাবে। এসময় লতার আগা কেটে নিন এবং গাছের গোড়ার তিনটি গাঁটের উপর লতা থেতলে দিন। তখন পাতার কোলে থাকা অঙ্কুর বাড়তে আরম্ভ করবে। ১০ দিন পর থেতলানো পাতার উপরের লতাটি কেটে ফেলুন। এরপর প্রতিটি শেকড় গাঁট থেকে আলাদা করে কেটে ফেলুন। ৪ ইঞ্চি পলিথিন ব্যাগে বালি-মাটি, কাঠের গুঁড়ো ও কম্পোস্ট সমানভাবে মিশিয়ে ওই একটি গাঁটযুক্ত কাটিং রোপণ করতে হবে। সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে শিকড় নষ্ট না হয়। পলিথিন ব্যাগকে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে এবং দু'তিন দিন পর পর পানি সেচ দিতে হবে। ৩ সপ্তাহের মধ্যে কাটিংয়ে নতুন পাতা গাঁট থেকে ছাড়তে আরম্ভ করবে। এভাবে অতি কম সময়ের মধ্যে গোলমরিচের চারা উৎপাদন সম্ভব।

আইন ও মানবাধিকার

শিশু আইন

শিশুরা হচ্ছে জাতির ভবিষ্যত এবং একই সাথে সমাজের সবচেয়ে দুর্বল অংশ। শিশুর প্রতি ব্যবহারে সর্তকতা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিশ্বশিশু পরিস্থিতিতে পরস্পরবিরোধী একটি অবস্থা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও বর্তমান বিশ্ববাসীদের মধ্যে এক জায়গায় একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়, যা হচ্ছে শিশু অধিকার সম্পর্কে পূর্বেকার যে কোনো সময়ের চেয়ে আরো অনেক বেশি সচেতনতা। শিশুর প্রতি দায়িত্ববোধ এখন আর শুধু নীতিবোধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়-বরং তা ক্রমবর্ধমান হারে বৃহত্তর সামাজিক ও আইনানুগ বাধ্যবাধকতার আওতায় চলে আসছে । অধিকার বিষয়ক আলোচনার পূর্বে কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন আবশ্যক ।

শিশু হিসেবে কাদের গণ্য করা হবে?

সেভ দি চিলড্রেন থেকে প্রকাশিত "বাংলাদেশে কর্মজীবী শিশু -ম্যাথিউ এ কিং ও সহযোগী রায়ান এর নক্স" বইটিতে বাঞ্চেট তার ১৯৯৬ সনে পরিচালিত গবেষণায় শিশু সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হলো -যে মানব সন্তানের কিছু বোঝার ক্ষমতা নেই তাকে বলা হয় শিশু। এটা নির্ভর করে তার শারীরিক বিকাশ ও জীবনযাপন পরিস্থিতির উপর - বয়স কমবেশী হতে পারে ।

সাধারণভাবে বয়সের তারতম্যের কারণে আমরা কাউকে শিশু, কাউকে যুবক, কাউকে বৃদ্ধ বলে থাকি। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে ১৮ বছরের কম বয়সী যেকোন মানব সন্তানকেই শিশু বলা হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতি ১৪ বছরের নীচে যে কোন বালক-বালিকাকে শিশু বলছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে প্রচলিত সাবালকত্ব আইনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সাবালকত্বের বয়স শুরু হবে ১৮ বছর থেকে। এই সংজ্ঞা দুটির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বাংলাদেশ, জাতিসংঘে প্রদত্ত প্রতিবেদন এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে "শিশু এবং অল্পবয়সী" শব্দটি ব্যবহার করছে। শিশুর বয়সের প্রমাণের বিষয়টি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে; বিশেষত আদালতে প্রমাণের ক্ষেত্রে । বাংলাদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বয়স সম্পর্কিত কোন গ্রহণযোগ্য লিপিবদ্ধকরণ ব্যবস্থা প্রচলিত নেই; যদিও কাগজে কলমে মিউনিসিপ্যালিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদের উপর জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে । বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ যৌথভাবে ইউনিসেফের সহায়তায় বিশেষ কিছু এলাকায় শিশুর জন্ম নিবন্ধীকরণের জন্য তুলনামূলক কার্যকর পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে যার প্রকৃত দুটি উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা হয়েছে-

- শিশুর বয়স সম্পর্কিত বিরোধ কমিয়ে আনা এবং সুবিচার নিশ্চিত করা ।
- যেহেতু শিশুর জন্ম নিবন্ধীকরণে ছবি ও জন্ম তারিখ ব্যবহার করা হয় সেহেতু শিশু পাচার ও অপহরণের মামলা গুলোতে শিশুকে চিহ্নিতকরণের পদ্ধতিটি উন্নততর হবে।

যদিও শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার কিছু নির্ধারিত প্রকল্পে শিশুর বয়সের বিষয়ে সুনির্ধারিত নিয়ম মেনে চলছে তথাপিও দেশের অন্যান্য স্থানে এবং অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে শিশুর বয়স নির্ধারণে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম মানা হয় না। যেমন- বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইনে শিশুর বয়সকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

বাংলাদেশে প্রযোজ্য প্রচলিত বিভিন্ন আইনে শিশুর সংজ্ঞা

১. চাকুরিতে নিয়োগের অনুমতি প্রসঙ্গে-(কারখানা আইন-১৯৬৫; দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন-১৯৬৫; শিশু শ্রমিক নিয়োগ আইন-১৯৩৮) ১২ থেকে ২১ বছরের মধ্যে প্রযোজ্য।

২. বিবাহ বয়স আইন- মেয়েদের জন্য-১৮ বছর ও ছেলেদের জন্য-২১ বছর ।

৩. তামাক, সুরা বা অন্য কোন মারাত্মক ড্রাগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ১৬ বছর হতে হবে।

৪. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বশেষ বয়স ১০ বছর।

৫. সামরিক বাহিনীতে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করতে ১৬ বছর হতে হবে (অভিভাবকের সম্মতিতে)।

৬. ফৌজদারী দায়-দায়িত্ব- ১২ বছর থেকে সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব এবং ফৌজদারী আইন ভঙ্গ করা সম্পর্কিত খণ্ডনযোগ্য আনুমানিক বয়স সীমা-৭ থেকে ১১ বছর।

৭. গ্রেফতার,আটক বা কারারুদ্ধের মাধ্যমে ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা (ফৌজদারী দায়-দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত) নির্ধারিত কোন বয়স নেই।

৮. মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে -১৭ বছরের উর্ধ্বে; ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড-৭ বছর ,তবে শর্ত থাকে যে বয়সের অনুমান সম্পর্কে কোন যুক্তি খণ্ডন করা হয় নাই ।

৯. আদালতে সাক্ষ্য দেয়া প্রসঙ্গে- যদিও সাক্ষ্য দেয়ার জন্য কোন সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারিত নেই তবে সাক্ষীকে অবশ্যই প্রশ্ন বোঝা এবং উত্তর দেবার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন ও সচেতন হতে হবে ।

১০. আদালতে অভিযোগ দায়েরের মাধ্যমে প্রতিকার পাবার ক্ষেত্রে (অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া) ১৮ বছর হতে হবে।

১১. যুদ্ধে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে- নন-কমিশন অফিসারের ক্ষেত্রে ৬ মাসের প্রশিক্ষণ শেষ হবার পর এবং কমিশন অফিসারের ক্ষেত্রে দুই বছরের প্রশিক্ষণ শেষ হবার পর।

[Source: First periodic report of the Government of Bangladesh under the Convention on the Rights of the Child (Draft); Ministry of Women and Children Affairs; Government of People's Republic of Bangladesh; Dhaka, November-2000]

এর বাইরেও বাংলাদেশে প্রচলিত কিছু কিছু আইনে শিশু হিসেবে কাদেরকে অভিহিত করা যাবে সে সম্পর্কিত বিধানের উল্লেখ রয়েছে।

- ✍ চুক্তি আইনে বলা হয়েছে যে, ১৮ বছর বয়সের কম কোন ব্যক্তি চুক্তি করতে পারে না। এই আইনে ১৮ বছরের কম বয়সের মানব সন্তানকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
- ✍ নিম্নতম মজুরি আইনে ১৮ বছর পূর্ণ না হলে সে শিশু হিসেবে গণ্য হয়।
- ✍ খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীদের তালাক আইনে নাবালক নির্ধারণের ক্ষেত্রে পুত্রের ১৬ বছর এবং কন্যার ১৩ বছরের কম হলে নাবালক বলা হয়েছে।
- ✍ খনি আইনে ১৫ বছর পূর্ণ না হলে তাকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়। শিশুকে খনিতে কাজে নেয়া যায় না।
- ✍ ১৯৩৯ সালের মটর গাড়ী আইনে ১৮ বছরের কম বয়সের ব্যক্তিকে গাড়ী এবং ২০ বছরের কম বয়সের ব্যক্তিকে বড় গাড়ী চালানোর অনুমতি দেয়া হয় না।

এত বৈপরিত্য সত্ত্বেও এই মুহূর্তে আমাদের জন্য যে বিষয়টি আশার সঞ্চার করছে সেটি হলো যে সরকার শিশুর সংজ্ঞা নির্ধারণের এই জটিল বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছেন। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের দ্বিমাসিক নিউজলেটার জুলাই-আগষ্ট/২০০৫ সংখ্যায় মানব জমিনের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়।

আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার

শিশু অধিকার সনদের অনুসরণে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়স্ক সব বালক-বালিকা শিশু হিসেবে গণ্য হবে। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি জাতীয় সংসদে "দি কোর্ট অব ওয়ার্ডস (সংশোধন আইন)-২০০৫" নামের একটি বিল উত্থাপিত হয়েছে। ভূমি প্রতিমন্ত্রী উকিল আব্দুর সাত্তার বিলটি উত্থাপন করলে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ৬ সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। বিলে বলা হয়েছে, দেশের আর্থসামাজিক বিবেচনায় বিভিন্ন আইনে শিশুদের ভিন্ন ভিন্ন বয়স নির্ধারণ এবং আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ অনুসরণের লক্ষ্যে দি কোর্ট অব ওয়ার্ডস আক্ট (অপঃ) ১৯৭৯-এর সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই আইনে শিশুর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি তার বয়স ২১ বছর পরিপূর্ণ করেনি সেই শিশু। প্রায় ২৬ বছর আগে প্রণীত এ আইনের কার্যকারীতা- বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়েছে। এদেশের আবহাওয়া ও প্রকৃতিতে বেড়ে ওঠা বালক-বালিকারা সাধারণত ১৮ বছর বয়সে নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে সংরক্ষণ, ভাল ও মন্দ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এ বিবেচনায় বিলটি আনা হয়েছে।

শিশু অধিকার

আজকের শিশু জাতির সোনালী ভবিষ্যতের স্থপতি। সুন্দর কল্যাণকর জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন এমন সুন্দর পরিবেশ যেখানে জাতির ভবিষ্যত স্থপতিগণ সকল সম্ভাবনাসহ সুস্থ, স্বাভাবিক ও স্বাধীন মর্যাদা নিয়ে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিকভাবে পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারবে। শিশুদের জন্য এরূপ একটি পরিবেশ গঠন কারো দয়া বা অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল থাকলে চলবে না। এজন্য প্রয়োজন শিশুর অধিকার সম্বলিত উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং তার সফল বাস্তবায়ন। এই বাস্তব সত্য উপলব্ধি করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিশু অধিকারের উপর বিভিন্ন আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে। বাংলাদেশও পরিবর্তনশীল সময়ের দাবি অনুযায়ী শিশু অধিকারের উপর বিভিন্ন আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এক অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের অধীনে শিশু অধিকারসমূহ

- ✍ শিশু আইনে শিশু অধিকার
- ✍ অন্যান্য আইনে শিশু অধিকার

দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিশুদের জন্য সুষ্ঠু কার্যক্রম গ্রহণ অপরিহার্য। প্রত্যেক শিশুকে দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় সকলের অংশগ্রহণ একান্ত বাঞ্ছনীয়। শিশুরাই দেশের ভবিষ্যত কর্ণধার। জাতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে শিশুদের উন্নয়নের সার্বিক কার্যক্রম অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের অধীনে শিশু অধিকারসমূহ

অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার, অবসর ও বিনোদন, গ্রেফতার ও দণ্ড থেকে বিশেষ সুরক্ষা, দত্তক গ্রহণ ও প্রদান, পাচার থেকে সুরক্ষা, পরিবার বঞ্চিত, শিশুর ক্ষেত্রে সঠিক যত্ন, মর্যাদা ও সুনাম, মানবিক আচরণ, শিক্ষা লাভ, শোষণ থেকে রক্ষা, উন্নত জীবনমান, চিকিৎসা পরিচর্যা। এছাড়াও

- ✍ জন্ম নিবন্ধন ও আইনসম্মত পরিচিতি
- ✍ পারিবারিক সংহতির পিতামাতার সাথে বসবাস
- ✍ প্রতিবন্ধী শিশু
- ✍ পুনরুজ্জীবন ও পুনসংহতকরণ বেঁচে থাকা
- ✍ বিকাশ লাভ
- ✍ মত, ভাব চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা
- ✍ সঠিক লালন পালন মেলামেশার স্বাধীনতা
- ✍ মাদকের অপব্যবহার থেকে নিজেকে রক্ষা এবং শারীরিক ও মানসিক উন্নয়ন নিশ্চিত
- ✍ সশস্ত্র সংঘাত থেকে সুরক্ষা সামাজিক নিরাপত্তা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক
- ✍ সংখ্যালঘু শিশু

শিশু আইনে শিশু অধিকার

বাল্য অপরাধী হিসাবে জামিন, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ থেকে রক্ষা, নিষ্ঠুর আচরণ থেকে রক্ষা।

অন্যান্য আইনে শিশু অধিকার

শ্রম আইনে শিশু

- ঝুঁকিপূর্ণ ও শিশু শ্রমে নিয়োগ নিষিদ্ধ স্থানে নিয়োগ থেকে সুরক্ষা
- শ্রম বিষয়ে বন্ধকী চুক্তি থেকে রক্ষা
- কর্মজীবী শিশু হিসেবে বিশেষ সুবিধা
- কর্মজীবী মায়ের সন্তান হিসেবে শিশু কক্ষ নবজাত ও ভূমিষ্ট হবে এমন শিশু

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে শিশু

ধর্ষণের ফলে জন্মগ্রহণকারী শিশু পারিবারিক আইনে শিশু

- ভরণপোষণ
- শিশুর হেফাযত
- সঠিক প্রতিপালন ও অভিভাবক

শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০

অধ্যায়-২

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

এদেশের বৃহদাংশে শিশুই প্রথম শিক্ষার্থী এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক যোগ্যতা অর্জনের পরিবেশ তাদের জন্য সীমিত। তাদের জন্য বিদ্যালয়-প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য শিশুর সঙ্গে একত্রে এই প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা শিশুর মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। কাজেই এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা যায়। এই পর্যায়ে শিক্ষাক্রম হবে মূলত শিক্ষার প্রতি, বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টিমূলক। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী হবে ৫+ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে একটি করে বাড়তি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও একটি করে শ্রেণীকক্ষ বৃদ্ধি করা ব্যয়বহুল কাজ। এসবকিছু বিচার করে একই সঙ্গে সকল বিদ্যালয়ে এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শুরু না করে, ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। এই মুহূর্তে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রথম শ্রেণীতে সাড়ে পাঁচ বছর বয়সে ভর্তি করে প্রথম ছয় মাস প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা হিসাবে চালু করা যেতে পারে। পাশাপাশি এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয়গুলির প্রস্তুতি চালানো হবে যাতে ২০০৫ সালের মধ্যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫+ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা যায়। এর বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এর ব্যয়ভার বহনে ও ব্যবস্থাপনায় জন্য অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

খ. প্রাথমিক শিক্ষা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যাধিক। দেশের সব মানুষের শিক্ষার আয়োজন এবং জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তোলার অনন্য ধাপ প্রাথমিক শিক্ষা। দেশের উন্নতির লক্ষ্যে সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষার মান যুগপযোগী করার লক্ষ্যে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার পর অনেকে কর্মজীবন আরম্ভ করে। শিক্ষার এই স্তর পরবর্তী সকল স্তরের ভিত্তি সৃষ্টি করে বিধায় যথাযথ মানসম্পন্ন উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষা হবে সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক, এবং সকলের জন্য একই মানের। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

- শিশুর যথাযথ মানসম্পন্ন ব্যবহারিক সাক্ষরতা নিশ্চিত করে তাবে উচ্চতর ধাপের শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী ও আগ্রহী করে তোলা।
- শিশুকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষালাভের উপযোগী করে গড়ে তোলা।
- মুক্তিযোদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিশুর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশ গঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা।
- সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ এবং অর্থপূর্ণ শ্রমের প্রতি আকৃষ্ট করার মাধ্যমে শিশুকে তার জীবনসমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ করা।
- শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, মানবাধিকার, সহজীবন যাপনের মানসিকতা, কৌতূহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা।

কৌশল

- প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ২০০৩ সালের মধ্যে ছয় বছর, ২০০৬ সালের মধ্যে সাত বছর এবং ২০১০ সালের মধ্যে আট বছর করা হবে। এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা এবং শিক্ষকের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বাড়াতে হবে। ২০১০ সালের মধ্যে আট বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সকলের জন্য নিশ্চিত করার অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষাকে যে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক তা ২০১০ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর্যায়ক্রমে বিবেচনায় রেখে অর্থ যোগানের দিকে নজর রাখা হবে।
- একই পদ্ধতির মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বাংলাদেশের সংবিধানে ব্যক্ত করা হয়েছে। সংবিধানিক তাগিদে

বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারার- সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, ইবতেদায়ি মাদ্রাসা ও বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়/শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে যে বৈষম্য বিরাজমান তার অবসান ঘটিয়ে সবার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে একই মান ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। তবে যে সকল কিন্ডারগার্টেন ও-লেভেল এ-লেভেলসহ ইংরেজি মাধ্যমভিত্তিক পরবর্তী পর্যায়ের ফিডার স্কুল রূপে শিক্ষা প্রদান করবে সেগুলো সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে ইংরেজির মাধ্যমে পাঠদান করতে পারবে।

- শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ইবতেদায়ি মাদ্রাসাসমূহ আট বছর মেয়াদী শিক্ষা চালু করবে এবং প্রাথমিক স্তরের নতুন সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবস্তু

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার বিষয় সমূহ হবে মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি- সমাজ ও বিজ্ঞান। এছাড়া থাকবে চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, সংগীত ইত্যাদি। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজি অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে পড়ানোর ব্যবস্থা থাকবে এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে তা বাধ্যতামূলক হবে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলক ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রথম শ্রেণী থেকে সহপাঠ্যক্রমিক বিষয় থাকতে পারে। প্রাথমিক স্তরের শেষ তিন শ্রেণীতে অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জীবন পরিবেশের উপযোগী কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করা হবে, যাতে যারা আর বিদ্যালয়ে পড়বে না এ শিক্ষার ফলে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে।

ভর্তির বয়স

বর্তমানে চালু ৬+ বছরে বয়সে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হবে। এর সঠিক বাস্তবায়নের জন্য নিবন্ধীকরণের নিয়মও বাধ্যতামূলক করা আবশ্যক।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী

অনুপাত প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ঃ৪০।

শিক্ষা সামগ্রী

প্রাথমিক শিক্ষার নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলীর ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম-কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য পৃথক বিষয় ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা এবং শ্রেণীগত যোগ্যতা নির্ধারণ করে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষা সামগ্রী যথা পাঠ্যপুস্তক, এবং প্রয়োজনবোধে সহায়ক পুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা (নোট বই নয়- বিশ্লেষণ, উদাহারণ ও এক্সাসাইজ সম্বলিত পুস্তুক) ইত্যাদি প্রণয়ন করবে।

শিখন পদ্ধতি

শিশুর সৃজনশীল চিন্তা ও দক্ষতার প্রসারের জন্য সক্রিয় শিখন-পদ্ধতি অনুসরণ করে তাকে এককভাবে বা দলভিত্তিক কার্যসম্পাদনের সুযোগ দেওয়া হবে। ফলপ্রসূ শিক্ষাদান পদ্ধতি উদ্ভাবন, পরীক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য গবেষণাকে উৎসাহিত করা হবে এবং সহায়তা দেওয়া হবে।

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণীতে সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু থাকবে। পঞ্চম শ্রেণীর শেষে বৃত্তি পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা হবে অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী সমাপ্তকারী সকল ছাত্র-ছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবে। অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা যেতে পারে।

বিদ্যালয়ের উন্নতি ও শিক্ষার মান উন্নয়নে সমাজের সম্পৃক্ততা

বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ বিবেচনার ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আরো সক্রিয় করার লক্ষ্যে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কমিটিকে প্রয়োজনে আরো ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে। তবে পাশাপাশি কমিটির জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। সক্রিয় অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি প্রতিষ্ঠা করে অভিভাবকদের বিদ্যালয় ও তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্যে আরো উৎসাহী করার পদক্ষেপ নেয়া হবে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ও তা সর্বগ্রাহ্যভাবে যাচাইয়ের লক্ষ্যে শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় সরকারের উদ্যোগে অভিন্ন প্রশ্নপত্র ও যথোপযুক্ত ইনভিজিলেশন সাপেক্ষে পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণীর প্রাক-পাবলিক পরীক্ষা আর যতদিন পর্যন্ত এসএসসি পরীক্ষা থাকবে ততদিন পর্যন্ত টেস্ট পরীক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য উৎসাহ দেওয়া। এতে শিক্ষার প্রসার গতিশীল হবে। এই কার্যক্রমের জন্য খরচ তেমন না হওয়ারই কথা। কেননা এর জন্য কোনো নতুন সংস্থা বা কর্মকর্তার প্রয়োজন নেই। স্থানীয় উদ্যোগেই হবে এই কাজের মূল চালিকা শক্তি। শিক্ষার মান উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বা অন্য কোনো উপযুক্ত নামে প্রাথমিক ভাবে দশ-বারো লাখ টাকার একটি স্থায়ী তহবিল প্রতি থানায় গঠন করলে এর আয় থেকে এই কার্যক্রমের খরচ সংকুলান হতে পারে। আর এই তহবিলের অর্থ মূলত স্থানীয় বিত্তবানদের দান থেকে সংগৃহীত হতে পারে।

শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষকদের পদোন্নতি

- শিক্ষক নিয়োগের সর্বনিম্ন সাধারণ যোগ্যতা হবে প্রাথমিকের ১-৫ পঞ্চম শ্রেণীর জন্য দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচএসসি/মাধ্যমিক (যখন এই শিক্ষানীতি অনুসারে দ্বাদশ শ্রেণী শেষের পরীক্ষা মাধ্যমিক পরীক্ষা বলে গণ্য হবে) পাশ এবং ৬-৮ শ্রেণীর জন্য দ্বিতীয় বিভাগসহ স্নাতক ডিগ্রিধারী মহিলা বা পুরুষ। পরবর্তীতে এ সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে এবং সিএনএড বা বিএড (প্রাইমারি) অর্জন করতে হবে। শিক্ষকদের স্তর এবং বেতন স্কেল বস্তুনিষ্ঠ ভাবে বিন্যাস করে (যথা- সহকারী শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক) তাদের পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষকদের উৎসাহিত করা যেতে পারে।

- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং কর্মকালীন প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। প্রয়োজনবোধে ও সম্ভাব্যক্ষেত্রে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সামগ্রী যাতে প্রতিষ্ঠানগুলো পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের লাইব্রেরি সমৃদ্ধ করাও প্রয়োজন।
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সঙ্গে পদোন্নতির যোগসূত্র স্থাপন করা আবশ্যক। উচ্চতর ডিগ্রিধারী যোগ্যতাসম্পন্নদের সরাসরি নিয়োগ এবং ত্বরান্বিত পদোন্নতির মাধ্যমে উচ্চতর পদ পূরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

শিক্ষক নির্বাচন

সকল সরকারি এবং সরকারি অনুমোদন ও সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ি মাদ্রাসার জন্য মেধাভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ একটি পৃথক শিক্ষক নির্বাচনী কমিশন গঠন করা হবে। এই কমিশন শিক্ষা ও প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হবে। যথাযথ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে কমিশন শিক্ষক নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পাদন করবে। এই নির্বাচন থানা বা জেলা ভিত্তিক হতে পারে। কমিশন দ্বারা নির্বাচিতদের মধ্য থেকে যথাযথ নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দিবে। বিদ্যালয়গুলি প্রত্যেক বছর তাদের কী কী বিষয়ে কতজন শিক্ষক প্রয়োজন (যদি প্রয়োজন থাকে) তা থানা ভিত্তিক সমন্বয় করে কমিশনকে জানাবে- আর এই ভিত্তিতে একটি বছরে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নির্বাচনের থানা ভিত্তিক লক্ষ্য স্থির করা হবে। [এই কমিশনকে মাধ্যমিক ও বেসরকারি (সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত) ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক নির্বাচনের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে- এ বিষয়ে পরে যথাস্থানে প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের তত্ত্বাবধান ও পরীবিক্ষণ

- বিদ্যালয়ে অভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মূলত প্রধান শিক্ষকের ওপর তাই এই দায়িত্ব দক্ষতার সাথে যাতে প্রধান শিক্ষকগণ পালন করতে পারেন সেই জন্য তাদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের বহিঃতত্ত্বাবধানের ও পরিবীক্ষণের কাজ যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করা আবশ্যক। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে স্থানীয় সরকারকে সংশ্লিষ্ট করা বাঞ্ছনীয়। এই কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরকে (যেমন-এটিপিও) বাস্তবসম্মতভাবে বিদ্যালয়ের সংখ্যা নির্ধারণ করে দিতে হবে যাতে তারা তত্ত্বাবধায়ন ও পরিবীক্ষণ কাজ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যথেষ্ট সময় দিয়ে সুষ্ঠভাবে পালন করতে হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীন বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। কোন কোন গ্রামে বিদ্যালয় নেই বা কোন কোন গ্রামে আরো বিদ্যালয় প্রয়োজন তা জরিপের মাধ্যমে নির্বাচন করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হবে। সরকারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বেসরকারি বিদ্যালয় স্থাপনকে উৎসাহিত করা হবে। তবে সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সকল বিদ্যালয়ে যেন উন্নত (সমান) মানের শিক্ষাদান করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

অন্যান্য

ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারি এডুকেশন (নেপ)-কে অভীষ্ট মানের শীর্ষ পর্যায়ের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। যাতে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম কার্যকরভাবে সম্পন্ন করতে পারে- যেগুলোর মধ্যে রয়েছে পিটিআইগুলোর একাডেমীক স্টাফদের এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও প্রজেক্টভুক্ত অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, মৌলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম তৈরি ও অনুমোদন, প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান, প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষা পরিচালনা ও ডিপ্লোমা প্রদান করা, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা, কর্মশালা, সম্মেলন পরিচালনা ইত্যাদি। সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমগ্র জাতিকে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে হবে।

সচেতনতা

কৌটায় মসলা জাতীয় ফসল সংরক্ষণ

কৌটায় মসলা জাতীয় ফসল সংরক্ষণের সময় বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। সেগুলো হল-

১. সংরক্ষণের ক্ষেত্রে স্থান বা স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা এবং গুদাম পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. পাত্র রোদে শুকিয়ে নিতে হবে যেহেতু সংরক্ষণের পাত্র পরিষ্কার ও আর্দ্রতামুক্ত করা দরকার।

৩. পাত্রের মুখ ভাল করে লাগাতে হবে যাতে আর্দ্রতা ও পোকামাড় প্রতিরোধ করা যায়।

৪. পোকামুক্ত শস্যদানা সংরক্ষণ করতে হবে।

৫. মাঝে মাঝে পর্যবেক্ষণ করে রোদে শুকাতে হবে। বর্ষাকালে বেশি সতর্ক থাকতে হবে।

৬. যে ফসল যে মাসে উঠে তখনই তা যত্নসহকারে সংরক্ষণ করতে হবে।

৭. টিনে মরিচা পড়েছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন মসলা সংরক্ষণ করা যেতে পারে। যেমন:

হলুদ: ভাল করে ধুয়ে পানি ঝরাতে হবে। তারপর রোদে শুকিয়ে কৌটায় সংরক্ষণ করতে হবে।

মরিচ: বাজার থেকে নিয়ে এসে ২/৩ দিন ভাল করে শুকিয়ে বোঁটা ফেলে সংরক্ষণ করতে হবে।

ধনে: প্রথমে বাজার থেকে এনে আলগা ময়লা ও মাটির কণা পরিষ্কার করব। তারপর ভাল করে পানি ঝরতে হবে। তারপর কুলা বা ডালায় করে রোদে শুকাতে হবে। ভালভাবে শুকিয়ে ঝরঝরে হলে ঢাকনাযুক্ত কাচের পাত্রে বা প্লাটিকের বৈয়ামে সংরক্ষণ করে রাখব।

জিরা: জিরা ধোয়ার সময় খুব বেশি সময় ভিজানো যাবে না। পরে ধানেরমত সংরক্ষণ করতে হবে।

এলাচ ও দারুচিনি: পরিষ্কার কৌটায় সংরক্ষণ করতে হবে।

পোস্তাদানা: পরিষ্কার করে বেছে অ্যালুমিনিয়ামের ডিশে করে রোদে শুকাতে হবে। তারপর ঠাণ্ডা করে কৌটায় সংরক্ষণ করতে হবে।

সরিষা: কুলা দিয়ে ঝেড়ে মাটি পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপর কাচের বা প্লাষ্টিকের কৌটায় সংরক্ষণ করতে হবে।

লবঙ্গ, জয়ত্রী ও জায়ফল: ফুল ও ফলের বৃতি সুগন্ধি মসলা। সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কাচের বৈয়ামের ব্যবহার করা হয়।

স্বাস্থ্য

শিশুর খাদ্য চাহিদা

নবজাত শিশু ও শৈশবকালের সব পর্যায়ের চাহিদা পূরণের বিষয়টি সম্পর্কেও খাদ্য চাহিদা সম্পর্কে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। দেহ বৃদ্ধি ও গঠনের জন্য শৈশবে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। ছোট শিশুর দেহের বৃদ্ধির হার দ্রুত থাকে। পাঁচ বছর পর্যন্ত শিশুদের বৃদ্ধি সময় এই সময় পর্যাপ্ত খাদ্য না দেওয়া হলে বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। শিশুর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল ২ বছর সময় পর্যন্ত। শিশুর পুষ্টির উপাদানের চাহিদা বড়দের চেয়ে বহুলাংশে বেশি। প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট চাহিদা বেশি হয়। নিশ্চিত করতে হবে শিশুর খাবারে প্রোটিনের গুণাগুণ ও পরিমাণ শিশুদের ক্যালরির চাহিদার পরিমাণ প্রতি কেজি ওজনে ২/৩ গুণ বেশি হয়। শিশুদের ৬ মাসের পর কেবলমাত্র দুধের উপর নির্ভর থাকা উচিত হয়। এতে বাড়তি পুষ্টির চাহিদা পূরণ হয় না। শিশুদের খাবারে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ, ক্যালসিয়াম, লৌহ, ভিটামিন-এ, ডি ও সি অবশ্যই থাকতে হবে।

বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরীর খাদ্য চাহিদা

প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ লবণের প্রয়োজন বাড়ন্ত ছেলে-মেয়েদের বেশি। ছেলে-মেয়েদের এ পর্যায়ে আহারে রুচির ও পার্থক্য আসে। কিশোরীদের লৌহের চাহিদা বাড়ে। দেহের গঠনমূলক কাজ, খেলাধূলার জন্য পরিশ্রম ও বয়োঃসন্ধিকালীন শারীরিক পরিবর্তনের কারণে কৈশোরের পুষ্টি চাহিদা আরও গুরুত্ব লাভ করে। প্রাণিজ প্রোটিন, ক্যালরি, লৌহ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন বি, সি প্রভৃতি বিশেষ-বিশেষ পুষ্টি চাহিদা কৈশোরের।

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির খাদ্য চাহিদা

দেহের বৃদ্ধিজনিত সময় ২০-২৫ বছর বয়স পর্যন্ত খাদ্য চাহিদার প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। দেহের আকৃতি ও ধরণ অনুযায়ী প্রাপ্ত বয়সে ব্যক্তির খাদ্য চাহিদা বিভিন্ন প্রকার হয়। পুরুষের খাদ্য চাহিদা নারীদের তুলনায় বেশি হয়। কম পরিশ্রমী ব্যক্তি থেকে বেশি পরিশ্রমী ব্যক্তির খাদ্য চাহিদা বেশি হয়। গর্ভবতী মহিলাদের খাদ্য চাহিদা সাধারণ মহিলাদের তুলনায় বেশি হয়।

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার খাদ্য চাহিদা

একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের দেহের বৃদ্ধি না ঘটলেও দেহের ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। রক্ত তৈরি রোগ প্রতিরোধ ও বিপাক ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। বার্ধক্যে ভিটামিন, খনিজলবণের চাহিদা বৃদ্ধি পায় প্রোটিন, স্নেহ ও কার্বোহাইড্রেটের চাহিদা কমে যায়।

বিভিন্ন বয়সে পুষ্টি উপাদানের চাহিদাগুলো হল-

১. শিশুর দেহ গঠনের জন্য যেই পরিমাণ প্রোটিন দরকার প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের রক্ষণাবেক্ষণের প্রোটিনের তুলনায় বেশি।

২. অসুস্থ অবস্থায় দেহের ক্ষয়পূরণের জন্য প্রোটিনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

৩. শিশুর বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গর্ভবতী মায়ের খাদ্য চাহিদা বেশি হয়।

৪. কম পরিশ্রমী লোকের খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহের উপাদান থেকে বেশি পরিশ্রমী লোকের খাদ্যে এ সকল উপাদান বেশি থাকে।

৫. ছোট ছেলে-মেয়েদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্নেত পদার্থের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হয়।

৬. ক্যালরির প্রয়োজন কমে যায় যেহেতু বার্ধক্যে শারীরিক পরিশ্রম কম হয়।

৭. অস্থির গঠনের কারণে জন্মের পর থেকে ২০ বছর পর্যন্ত ভিটামিন ডি-এর চাহিদা বেশি হয়।

৮. যে ব্যক্তি যত বেশি কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করে তার থায়ামিনের চাহিদা তত বাড়ে।

৯. শৈশব-কৈশোর ও গর্ভাবস্থায় খাদ্যের প্রোটিনের পরিমাণ বেশি হলে রিবোফ্লাভিনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

১০. নিয়াসিনের চাহিদা অসুস্থ বা গর্ভাবস্থায় থাকলে বৃদ্ধি পায়।

১১. ক্যালসিয়াম বাড়ন্ত শিশুদের জন্য বেশি দরকার।

১২. লৌহের চাহিদা বাড়ন্ত শিশু, গর্ভবতীর ও বাড়ন্ত শিশুর বাড়ে।

১৩. আয়োডিনের চাহিদা গর্ভধারণকালে, শৈশব ও স্তন্যদানকালে বাড়ে।

১৪. সোডিয়ামের চাহিদা বৃদ্ধি পায় যখন ডায়রিয়া এবং ব্যায়াম বা পরিশ্রমের পর অতিরিক্ত ঘাম হয়।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় তালিকা করে বিভিন্ন বয়সের খাদ্য চাহিদা দেখানো হল–

খাদ্য উপাদানের দৈনিক অনুমোদিত চাহিদা

বয়স বছর	কিলো-ক্যালরি	আমিষ (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মি. গ্রা.)	লৌহ (মি. গ্রা.)	ভিটামিন 'এ' (মি. গ্রা.)	ভিটামিন বি১ (মি. গ্রা.)	ভিটামিন বি২ (মি. গ্রা.)	নায়ামিন (মি. গ্রা.)	ভিটামিন 'সি' (মি. গ্রা.)	ভিটামিন 'ডি' (মি. গ্রা.)	ফলিক অ্যাসিড (মি. গ্রা.)	ভিটামিন বি২ (মি. গ্রা.)
০-১	৮২০	২২	৫০০-৬০০	১০	৩০০	.০৪	.০৪	৫.৪	২০	১০	৫০	০.৩
১-৩	১৩৬০	২৫	৫০০-৬০০	১০	২৫০	০.৭	০.৪	৯.০	২০	১০	১০০	০.৯
৪-৬	১৮২০	৩১	৪৫০	১০	৩০০	০.৯	১.০	১২.১	২০	১০	১০০	১.৫
৭-৯	২১৯০ পুরুষ-স্ত্রী	৩৮ পুরুষ-স্ত্রী	৪৫০	১০ পুরুষ-স্ত্রী	৪০০	১.১ পুরুষ-স্ত্রী	১.২ পুরুষ-স্ত্রী	১৪.৫ পুরুষ-স্ত্রী	২০	২৫	১০০	১.৫
১০-১২	২৬০০-২৩৫০	৪৬-৪৫	৬৫০	১০-১০	৫৭৫	১.৩-১.২	১.৪-১.৩	১৭.২-১৫.৫	২০	২৫	১০০	২.০
১৩-১৫	২৬৮০-২২৬০	৫৭-৪৭	৬৫০	১৮-২৪	৭২৫	১.৩-১.১	১.৫-১.২	১৭.৭-১৪.৯	৩০	২৫	২০০	২.০
১৬-১৯	২৮২০-২১০০	৫৮-৪৬	৫৫০	৯-২৪	৭৫০	১.৪-১.০	১.৫-১.১	১৮.৬-১৩.৭	৩০	২৫	২০০	২.০
২০-৩৯	২৭৬০-২০০০	৫২-৪০	৪৫০	৯-২৮	৭৫০	১.৪-১.০	১.৫-১.১	১৮.২-১৩.২	৩০	২৫	২০০	২.০
৪০-৪৯	২৬২০-১৯০০	৫২-৪০	৪৫০	৯-২৮	৭৫০	১.৩-০.৯	১.৪-১.০	১৭.৩-১২.৫	৩০	২৫	২০০	২.০
৫০-৫৯	২৪৮০-১৮০০	৫২-৪০	৪৫০	৯-৯	৭৫০	১.২-০.৯	১.৪-১.০	১৬.৪-১৯.৯	৩০	২৫	২০০	২.০
৬০-৬৯	২২১০-১৬০০	৫২-৪০	৪৫০	৯-৯	৭৫০	১.১-০.৮	১.২-০.৯	১১,৬-১০.৬	৩০	২৫	২০০	২.০
৭০-৭৯	১৯৩০-১৪০০	৫২-৪০	৪৫০	৯-৯	৭৫০	১.০-০.৭	১.১-০.৮	১২.৭-৯.২	৩০	২৫	২০০	২.০
	+১৫০	+১৪	+৬৫০	+৫	-	+১.২	+১.২	+১৯	+২০	+৭৫	২০০	-১.০
	+৩৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	+৭৫০	+২৫	+৬৫০	-	+৪৫০	-০.৪	+০.৪	+০.৪	+২০	+৭৫	+১০০	+০.৫

বি. দ্র.ঃ

দেহের ওজন-প্রাপ্ত বয়স্কঃ ৬০ কিলোগ্রাম

দেহের ওজন প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাঃ ৫০ কিলোগ্রাম

(এক কিলোগ্রাম = ১.০৭ সের)

উৎস ঃ সমন্বিত ফলিত পুষ্টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল-বারটান

কীভাবে জ্বর মাপতে হয় তার সচিত্র পদ্ধতি

- সবসময় থার্মোমিটারের যে প্রান্তে পারদ আছে তার বিপরীত দিকে থার্মোমিটারটি ধরতে হবে (চিত্র - ১)। কখনোই যে প্রান্তে পারদ আছে সেদিকে ধরা যাবে না। কারণ শরীরের তাপমাত্রা থার্মোমিটারের তাপমাত্রাকে প্রভাবিত করে।

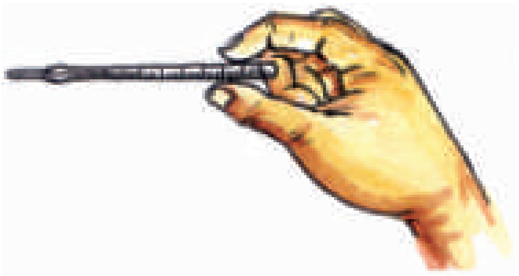

চিত্র - ১

- প্রথমে থার্মোমিটার বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ধুয়ে ঝাকিয়ে থার্মোমিটারের পারদ ৯৮ ° ফা. নীচে আনতে হবে (চিত্র - ২ ক, চিত্র - ২ খ)।

চিত্র - ২ ক

- এরপর থার্মোমিটারের যে প্রান্তে পারদ আছে সেই প্রান্তটি মুখের একপাশে জিহ্বার নীচে এক মিনিট রাখতে হবে (চিত্র - ৩)। অথবা একইভাবে বগলের নীচেও রেখে জ্বর মাপা যায়। এক মিনিট পর বের করে পারদের অবস্থান দেখতে হবে। তাপমাত্রা ৯৮° ফা. এর বেশি হলে জ্বর আছে বলে মনে করা হয়।

চিত্র - ২ খ

- জ্বর মাপার পর থার্মোমিটারটি ভালো করে ধুয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

চিত্র - ৩

কম্পিউটার টিপস্

মনিটর

সমস্যা: "মনিটরে ডিসপ্লে আসে কিন্তু কালার ঠিক নেই।"

সম্ভাব্য কারণ:

- ডিসপ্লে (ভিজিএ/এজিপি) কার্ডে সমস্যা হতে পারে।
- মনিটরের সিগনাল ক্যাবলে সমস্যা হতে পারে।
- মনিটরের কালার সেকশনে সমস্যা হতে পারে।

সমাধান:

- ডিসপ্লে কার্ড পরীক্ষা করে দেখতে হবে, প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হবে।

- মনিটরের কোন সিগনাল ক্যাবল ভেঙ্গে গেলে তা পরিবর্তন করতে হবে।

সমস্যাঃ "মনিটরের স্ক্রীন কাঁপতে থাকে/লম্বালম্বি ঝির ঝির দাগ পড়ে।"

সম্ভাব্য কারণঃ
- ডিসপ্লে (ভিজিএ/এজিপি) কার্ডে সমস্যা হতে পারে।
- মনিটরের সমস্যা থাকতে পারে।

সমাধানঃ
- ডিসপ্লে কার্ড ড্রাইভার রি-ইনস্টল করতে হবে।
- ডিসপ্লে কার্ড পরীক্ষা করে দেখতে হবে, প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হবে অথবা মনিটর পরীক্ষা করতে হবে।

সমস্যাঃ "কিছুক্ষণ চলার পর ধীরে ধীরে মনিটরের স্ক্রীনের কালার পরির্তন হতে থাকে।"

সম্ভাব্য কারণঃ
- ডিসপ্লে (ভিজিএ/এজিপি) কার্ডে সমস্যা হতে পারে।
- মনিটরের হাই ভোল্টেজ সার্কিটে সমস্যা হতে পারে।

সমাধানঃ
- ডিসপ্লে কার্ড পরীক্ষা/পরিবর্তন করতে হবে।
- মনিটরের হাই ভোল্টেজ সার্কিট পরীক্ষা/পরিবর্তন করতে হবে।

সমস্যাঃ "কিছুক্ষণ চলার পর মনিটরের পর্দা কাঁপতে থাকে।"

সম্ভাব্য কারণঃ
- ডিসপ্লে (ভিজিএ/এজিপি) কার্ডে সমস্যা হতে পারে।
- মনিটরের ডিসপ্লে স্ক্রীনে সমস্যা হতে পারে।

সমাধানঃ
- ডিসপ্লে কার্ড পরীক্ষা করে দেখতে হবে, প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হবে।
- মনিটরের ডিসপ্লে স্ক্রীন পরীক্ষা করে দেখতে হবে, প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হবে।

সমস্যাঃ "মনিটরে হিজিবিজি (Garbage) দেখা দেয়।"

সম্ভাব্য কারণঃ
- ডিসপ্লে (ভিজিএ/এজিপি) কার্ডে সমস্যা হতে পারে।
- মাদারবোর্ড পরীক্ষা করে দেখতে হবে, প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হবে।
- মনিটরে কোন সমস্যা হতে পারে।

সমাধানঃ
- ডিসপ্লে কার্ড পরীক্ষা করে দেখতে হবে, প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হবে।
- মাদারবোর্ড পরীক্ষা করে দেখতে হবে, প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হবে।
- মনিটর পরীক্ষা করে দেখতে হবে, প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হবে।

জানুয়ারি মাসের বিশেষ বিশেষ দিন

জাতীয় গ্রন্থ দিবস

'প্রিয়জনকে বই উপহার দিন' - জাতীয়ভাবে আমাদের বইয়ের প্রতি মূল্যবোধ পরিবর্তনের সাথে এ কথাটি একাত্ম। এছাড়াও কথিত আছে - 'বই কিনে কেউ দেওলিয়া হয় না'। প্রতি বছর পহেলা জানুয়ারি জাতীয় গ্রন্থ দিবস পালন করা হয়। এ দিবস পালনের মধ্য দিয়ে সারা বছর গ্রন্থ, গ্রন্থাগার এবং এ সংক্রান্ত নানা কর্মসূচির মাধ্যমে দেশ জুড়ে বইয়ের প্রসার ও ব্যবহার এবং মননশীলতার চর্চার ক্ষেত্রে সকলের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

জাতীয় সমাজসেবা দিবস

দোসরা জানুয়ারি জাতীয় সমাজসেবা দিবস পালন করা হয়। সমাজসেবার মাধ্যমে দেশ ও জনগণের সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়ণের ধারাকে গতিশীল করা সম্ভব। তাই সমাজে পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে সরকার এই দিবসটি ঘোষণা করেছে।

জাতীয় শিক্ষক দিবস

প্রতি বছর ১৯শে জানুয়ারি জাতীয় শিক্ষক দিবস পালিত হয়। শিক্ষা ও শিক্ষক একটি জাতির উন্নতির চাবিকাঠি। আর শিক্ষাদানের মতো জাতিকে গড়ে তোলার গুরুদায়িত্বে নিয়োজিত দেশের শিক্ষকসমাজের প্রতি সম্মান জানানোর জন্যই মূলত সরকার এই বিশেষ দিনটিকে ঘোষণা করেছে।

আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ দিবস

২৭ জানুয়ারি দিনটিকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ দিবস হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয় ২০০৫ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিতে হিটলারের সরকার প্রায় ৬০ লাখ ইহুদী ধর্মাবলম্বী এবং আরো ৩০-৪০ লাখ অন্যান্য জাতি, ধর্ম ও বিশ্বাসের মানুষ হত্যা করে। মানুষের ইতিহাসে ঘৃণ্যতম এই হত্যাকাণ্ডকে চরম লজ্জা এবং হত্যাকাণ্ডের শিকার মানুষদেরকে পরম বেদনা ও সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করার উদ্দেশ্য জাতি, ধর্ম, ভাষা বা অন্য কোনো কারণে পৃথিবীতে আর কাউকে যাতে হত্যার শিকার হতে না হয় সেই অঙ্গীকার করা।

আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট বিহীন দিবস

২৯ শে জানুয়ারি আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট বিহীন দিবস পালিত হয়। এ দিবসটির তাৎপর্য মূলত শিল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য, যেখানে সব শ্রেণী ও পেশার নারী-পুরুষ এমনকি শিশুরাও ইন্টারনেটের ওপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল। অতিমাত্রায় ইন্টারনেটে থাকার প্রভাব তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও পড়েছে। পরিবারের সদস্যরা পরস্পরকে সময় দিতে পারছেন না বা সময় দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করছেন না। এ দিবস পালনের মাধ্যমে আমাদের দৃষ্টিকে ইন্টারনেট থেকে সরিয়ে সত্যিকার জীবনকে মানে বন্ধু, পরিবার, স্বাস্থ্য এবং স্বাধীনতা ইত্যাদি উপভোগ করার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে।

দরিদ্র জনগণের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় তৈরি ওয়েবসাইট www.jeeon.com.bd দেখুন। সম্পূর্ণ তথ্য 'জীয়ন' শিরোনামে সিডি আকারে পাওয়া যাচ্ছে। সিডি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এমসিসি, ৩/১১ হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

D.Net
Development Research Network

www.dnet.org.bd

পল্লীতথ্য বুলেটিন একটি ডি.নেট প্রকাশনা। ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। পৌষ-মাঘ ১৪১৫, জানুয়ারি ২০০৯। ৬/৮ হুমায়ূন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ৮৮-০২-৮১৫৬৭৭২, ৮৮-০২-৯১৩১৪২৪, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮১৪২০২১, info@pallitathya.org.bd, www.pallitathya.org.bd

পল্লীতথ্য বুলেটিন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পরিচালিত 'অবলম্বন' প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত।